কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

হীরে কি গাছে ফলে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

হীরে কি গাছে ফলে?

রানীগঞ্জ স্টেশনে নেমে আরও সতেরো মাইল দূরে বিশ্বমামার মামার বাড়ি। জিপ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। একটা জিপ গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আসলে স্টেশনের বাইরে ছিল চার-পাঁচখানা জিপ গাড়ি। সেখান থেকে একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে বিশ্বমামার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আসুন স্যার!

ড্রাইভারটিকে বিশ্বমামা আগে দেখেননি। সেও বিশ্বমামাকে কখনো দেখেনি। তবু সে এত লোকের ভিড়ে বিশ্বমামাকে চিনল কী করে?

ড্রাইভারকে সে জিগ্যেস করতেই সে বলল, এ তো স্যার খুব সোজা! বউদি বলে দিয়েছেন, দেখবে একজন লম্বা মতন লোক, গায়ের রং খুব ফরসা, আর নাকটা, গন্ডারের শিং-এর মতন। আর সঙ্গে থাকবে দুটি বাচ্চা ছেলে!

বিলুদা বললে, গন্ডারের মতন নাক? ভাগ্যিস উনি বলেননি হাতির শুঁড়ের মতন!

বিশ্বমামা নিজের লম্বা, চোখা নাকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, গন্ডারের শিং এর মতন নাক তো খারাপ কিছু নয়! আর তোদের যে বাচ্চা ছেলে বললেন।

বিলুদা বললে, একটু ভুল বলেছে। আমি বাচ্চা নই, নীলু বাচ্চা! ড্রাইভারটির নাম বাস্তা সোরেন। সে সাঁওতাল হলেও বাংলা বলে জলের মতন। ইংরিজিও খানিকটা জানে। বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস হবে। বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে জিপ গাড়িটা যেতে লাগল একটা সরু রাস্তা দিয়ে। সরু তো বটেই, তা ছাড়াও রাস্তার অবস্থা ভালো না, এবড়ো-খেবড়ো মাঝে-মাঝে বড়-বড় খানা খন্দ। এখনও এখানে-সেখানে জল জমে আছে। আমরা চলেছি লাফাতে লাফাতে। তাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বেড়াতে বেরুনোটাই আনন্দের ব্যাপার।

একটু পরেই রাস্তাটা ঢুকে গেল একটা জঙ্গলের মধ্যে। কত রকম গাছ। আমি কিংবা বিলুদা অতশত গাছ চিনি না। বিশ্বমামা আমাদের গাছ চেনাতে লাগলেন। শাল, মহুয়া, জারুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আরও কত কী? অনেক গাছে ফুল ফুটে আছে। আমরা অনেক গল্পে এইসব গাছের নাম পড়ি। কিন্তু জারুলের সঙ্গে শিমূলের কী তফাত তা জানি না।

বিশ্বমামা বললেন, জানিস তো এরমধ্যে অনেক গাছই আমাদের দেশের নয়। বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এই দ্যাখ না। এই যে কৃষ্ণচূড়া। কী সুন্দর নাম। এই গাছ আনা হয়েছে ম্যাডাগাসকার থেকে। এখন আমাদের দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বমামা যে গাছটাকে কৃষ্ণচূড়া বলে দেখালেন, বাস্তা সোরেন সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটা তো গুলমোহর।

বিশ্বমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, অ্যাই নীলু, বল তো গুল মানে কী?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

বিশ্বমামা বললেন, তোরা কথায় কথায় এত গুল মারিস, আর গুল কথাটার মানেই জানিস না? বিলু তুই জানিস?

বিলুদার অবস্থাও আমার মতন।

বিশ্বমামা বললেন, গুল মানে ফুল। বাস্তা যে বলল গুলমোহর, সেটা ঠিক নয়। আমরা যে গুলকে বলি কৃষ্ণচূড়া, হিন্দিতে তাকেই বলে গুলমোর। মোহর নয় মোর। মোর মানে ময়ূর। ময়ূরের পাখার মতন ফুল। রংটা না মিললেও ফুলটা দেখতে অনেকটা ময়ূরের পালকের শেষ দিকটার মতন। কৃষ্ণের মাথায় একটা ময়ূরের পালক থাকে, তাই বাংলায় বলি কৃষ্ণচূড়া আর হিন্দিতে গুলমোর।

মুখ ফিরিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা বাস্তা। তোমরা পলাশকে কী বলে?

বাস্তা একটু চিন্তা করে বললে, আমি তো পলাশই বলি ইংরিজিতে বলে ফ্রেইম অফ দা ফরেস্ট!

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক বলেছ তো! যখন একসঙ্গে অনেক পলাশ ফুল ফোটে, তখন সমস্ত জঙ্গল যেন জ্বলতে থাকে। বাংলায় কিন্তু পলাশের আর একটা নাম আছে। নীলু আর বিলু, যদি সেই নামটা বলতে পারিস, ফিরে গিয়ে তোদের একদিন চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়াব।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বাস্তা জিগ্যেস করল, কী নাম? বাংলায় অন্য কী নাম আছে?

বিশ্বমামা বললেন, কিংশুক। সংস্কৃত কথা। কোথায় পলাশ আর কিংশুক! এই কিংশুক নামটা কিন্তু খুব মজার। চেনা-জানা আর কোনও ফুলের এরকম নাম নেই।

গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে উঠল। সামনের সিটে ঠুকে গেল বিলুদার কপাল।

বাস্তা বলল, আর বেশি দেরি নেই। ওই তো কারখানার চিমনি দেখা যাচ্ছে।

হাত দিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে বিলুদা জিগ্যেস করল, কিংশুক নামটা কেন মজার?

বিশ্বমামা বললেন, এটা নামই নয়, এটা একটা প্রশ্ন। কিম শুক? কিছু বুঝলি?

বিলুদা বললে, কী করে বুঝব, আমি কি সংস্কৃত পড়েছি নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, সংস্কৃত পড়ার দরকার নেই। মাঝে-মাঝে বাংলা অভিধান দেখলেই এসব জানা যায়। শুক মানে জানিস তো?

আমি বলে উঠলাম, আমি জানি, আমি জানি, এক রকম পাখি!

বিশ্বমামা বললেন, কী পাখি?

আমি বললাম, গল্পের বইতে শুক আর সারি এই দুটো পাখির নাম পড়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, গল্পের বইয়ের কথা ছাড়, আমরা যাকে টিয়া পাখি বলি, আগেকার দিনে তাকেই বলা হতো শুক পাখি। এখন পলাশ ফুলের ডগার দিকটা লক্ষ করে দেখবি, অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতন। তাই একসময় কোনও এক কবি মনে মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিম শুক? সত্যিই কি শুক বা টিয়া পাখির মতন? সেই থেকে কিংশুক নাম হয়ে গেছে।

বাস্তা জিগ্যেস করল, স্যার, আপনি বুঝি বোটানি পড়েছেন?

বিশ্বমামা বললেন, কখনো না। আমি ডিকশনারি পড়ি।

একটু পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম বিশ্বমামার মামার বাড়ি। আমার মায়েরও মামাবাড়ি। সুতরাং আমাদের দাদুর বাড়ি। কিন্তু এই দাদুকে আমরা কখনও দেখিনি।

দাদুর নাম জগদীশ, বিশ্বমামা তাকে ডাকেন জগুমামা বলে। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, বুড়ো বলে মনে হয় না। তিনি এখানে একটা ছোটখাটো কারখানা তৈরি করেছেন, এখানেই থাকেন, শহরে বিশেষ যান না। তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বমামা বলেন নতুন মামি। সুতরাং আমাদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন নতুন দিদিমা।

কী যত্নই যে করতে লাগলেন তিনি। সবসময় আমাদের নতুননতুন কী খাওয়াবেন সেই চিন্তা। বিশ্বমামা উৎসাহের সঙ্গে বলেন, নতুন মামি আরও খাওয়াও, তোমাদের এখানে খেতেই তো এসেছি।

কারখানাটা একটু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে জগুদাদুর বাংলো। অনেকগুলো ঘর। সামনে বাগান। পেছনে একটা পুকুর। হাঁস, মুরগি, গরু আছে নিজস্ব।

বাস্তা সোরেনকে আমরা প্রথমে ড্রাইভার ভেবেছিলাম। পরে বুঝলাম সে এখানকার প্রায় ম্যানেজারের মতন। জগু দাদুর ডান হাত বলা যায়। এই বাস্তাদা জিপ গাড়ি নিয়ে সকাল-বিকেল আমাদের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনে। বাস্তাদার বাড়িও কাছেই। বাস্তাদার একটি সাত-আট বছরের ছেলে আছে, তার নাম জাম্বো, তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব জমে গেল।

এই জাম্বোই এই গল্পের নায়ক।

জাম্বো কথা খুব কম বলে, খেলতে ভালোবাসে।

প্রত্যেকদিন সকালে ওর সঙ্গে আমরা ফুটবল খেলি একটা রবারের বল নিয়ে। সেই বলটা নিয়েই আবার ক্রিকেট খেলা হয়। অন্য বল নেই।

জাম্বো আবার নিজে ছবি আঁকে। ওদের বাড়ির সামনে একটা সিমেন্ট বাঁধানো চাতাল আছে। সেই চাতালের ওপর খড়ি দিয়ে আঁকে বড়-বড় ছবি। ওর আঁকার হাত আছে, শেখালে ও একদিন ভালো শিল্পী হতে পারবে।

জাম্বো সাধারণ ছবি আঁকে না। ঘোড়া এঁকে দুটো ডানা জুড়ে দিয়ে বলে পক্ষীরাজ। মানুষ এঁকে তার মস্তবড় কুলোর মতন কান জুড়ে দিয়ে বলে অন্য গ্রহের মানুষ। জাম্বোর যখন ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়, তখন সে খেলতেও চায় না।

আমাদের সঙ্গে জাম্বো মাঝে-মাঝে বেড়াতে যায়। আবার এক- একসময় যায় না, তখন ছবি আঁকে।

একদিন আমরা একটা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তাদের বাড়িতে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি চা খাওয়ার জন্যে। জাম্বো ছবি আঁকছে চাতালে।

বারান্দায় ডান দিকে একটা মস্ত বড় উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ওটা সবসময় জ্বলে। নেভাতে দেখিনি কখনো। ওই উনুনে চায়ের জন্য জল চাপানো হয়েছে।

বিলুদা বলল, বাস্তাদা, তোমাদের এখানে কয়লা খুব সস্তা, তাই তোমরা সবসময় উনুন জ্বালিয়ে রাখো। দেশলাই কাঠির খরচ বাঁচাও।

বাস্তাদা হেসে বলল, সস্তা মানে কী, আমাদের সব কয়লা তো বিনা পয়সায় বলতে গেলে!

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, বিনা পয়সায় কেন? কাছাকাছি অনেক কয়লার খনি আছে। কেউ বুঝি তোমাদের বিনা পয়সায় কয়লা দেয়?

বাস্তাদা বলল, অন্য কেউ দেবে কেন? আমাদের নিজেদেরই তো কয়লার খনি আছে।

বিশ্বমামা বললেন, জগুমামার কয়লা খনি আছে শুনিনি তো! কোথায় সেটা?

বাস্তাদা বলল, সে মজার ব্যাপার শোনেননি? আপনার জগুমামা গত বছর ওঁর বাংলোর পেছনে একটা পুকুর খোঁড়াচ্ছিলেন। এখানে তো শক্ত পাথুরে মাটি, পুকুর খোঁড়া সহজ নয়। চার ফুট খুঁড়তে না খুঁড়তে ঠং-ঠং করতে লাগল। কোদাল, গাঁইতি চালিয়ে মজুররা ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল তলা থেকে মাটির বদলে বেরুচ্ছে কয়লা। বেশ ভালো জাতের কয়লা। সরাসরি উনুনে এনে জ্বালানো যায়। পুকুরের বদলে আমরা পেয়ে গেলাম একটা কয়লার খনি!

বিশ্বমামা বললেন, সত্যিই তো মজার ব্যাপার। কিন্তু এখন কয়লাখনি সব গভর্নমেন্ট নিয়ে নেয় না?

বাস্তাদা বললে, সরকারের লোকদের জানানো হয়েছে। আপনার জগুমামা কখনো বে-আইনি কাজ করবেন না। সরকারি লোক এসে পরীক্ষা করে দেখে বলেছে, কয়লা পাওয়া গেছে বটে, কিন্ত জায়গাটা বেশি বড় নয়। ওই পুকুরের মাঝেই। ওইটুকু জায়গাতে কী করে যেন কয়লা জমে আছে। এইটুকু কয়লা খনি সরকার নিতে চায় না। আমরাই ব্যবহার করতে পারি। ওই কয়লাতে আমাদের আরও তিন-চার বছর চলে যাবে।

বিলুদা বলল, তাই দেখছি ওই পুকুরটায় কীরকম কালো-কালো নোংরা জল।

বাস্তাদা বলল, একটুখানি মোটে জল আছে। পাম্প করে তোলা যায়। তারপর আমরা দরকার মতন কয়লা কেটে নিই।

এরপর চা খেতে-খেতে আমরা কয়লার গল্প ছেড়ে অন্য গল্প করতে লাগলাম।

এক সময় বিশ্বমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখি তো, আমাদের জাম্বো সাহেব কী ছবি আঁকছে।

আমরাও দেখতে পেলাম।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে জাম্বো খড়ির বদলে একটা খসখসে পাথরের মতন জিনিস দিয়ে বড় করে কী যেন আঁকছে।

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, আজ কীসের ছবি আঁকা হচ্ছে জাম্বো?

জাম্বো গম্ভীর ভাবে বলল, এটা একটা গাছ। আর এই যে ফুলগুলো দেখছ, এগুলো সব এক একটা হীরে।

আমি বললাম, সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে বলল, গাছে হীরে ফলেছে। তাও এক-একটা হীরে তালের মতন বড়।

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, হাসছিস যে! গাছে কি হীরে ফলে না?

বিলুদা ইয়ার্কি করে বলল, ফলে বুঝি? তুমি দেখেছ? কোথায়, কামস্টাটকা না ম্যাডাগাস্কায়।

বিশ্বমামা জাম্বোর হাতের পাথরটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ওটা একবার দেখি তো জাম্বো।

সেটা হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে মেঝেতে দাগ কাটতে লাগলেন। অনেকটা শ্লেট-পেন্সিলের মতন দাগ পড়ল।

বিলুদা বলল, ওটাও হীরে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, না, এটা গ্র্যাফাইট। কাকে গ্র্যাফাইট বলে জানিস?

তারপরেই লাফিয়ে উঠে বললেন, এক্ষুনি জগুমামার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

দৌড়ে ও বাংলোতে গিয়ে বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, জগুমামা, তোমাকে একটা অনুরোধ করব? কালকেই অনেকগুলো মজুর লাগিয়ে তোমার পুকুরের সব কয়লা কাটিয়ে ফেলতে পারবে? কয়লা ওপরে জমা করে রাখলেও তো নষ্ট হয় না।

জগুদাদু বললেন, কেন, সব কয়লা একসঙ্গে কাটাতে হবে কেন?

বিশ্বমামা বললেন, আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব।

জগুমামা আপত্তি করলেন না। বিশ্বমামা নাম করা বৈজ্ঞানিক। তিনি নিতান্ত বাজে কথা বলবেন না। যখন সব কয়লা তুলে ফেলতে বলছেন নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু মুশকিল হল, বিশ্বমামা কিছুতেই তার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলবেন না। আমাদের কাছে বারবার বলতে লাগলেন, গাছে হীরে ফলে না? সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা বলল, কয়লা সব শেষ হলে তারপর বুঝি হীরের খনি বেরুবে?

বাস্তাদা বলল, এদিকে এত খনি আছে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, আসানসোল, কোনও খনিতে কখনো হীরে বেরিয়েছে বলে শুনিনি!

পরদিনই পঞ্চাশ জন মজুর কাজে লেগে গেল। বিশ্বমামা নিজে তদারকি করতে লাগলেন কাজের। সবসময় ওদের মধ্যে লেগে রইলেন। নিজে হাত লাগান মাঝে-মাঝে। ওঁর জামা-কাপড় সব কয়লার গুঁড়ো লেগে একেবারে কালো ভূত হয়ে গেল।

চারদিন পর দেখা গেল কয়লার স্তর খুব গভীর নয়। নিচে পাওয়া যাচ্ছে নরম মাটি। সব কয়লা তুলে ফেলার পর সেই নরম মাটি খুঁড়ে পরিষ্কার জল বেরুতে লাগল। এবার সেটা সত্যিকারের একটা পুকুর হয়ে গেল।

আমি আর বিলুদা বিশ্বমামাকে চেপে ধরে বললুম, কোথায় গেল তোমার সোনার গাছ আর হীরের ফুল?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, আমার জগুমামা একটা পুকুর কাটাতে গিয়ে কয়লা দেখে থেমে গিয়েছিল। আমি কয়লা সব তুলিয়ে পুকুরটা পুরো করে দিলুম। কয়লাও পাওয়া গেল। পুকুরও পাওয়া গেল, ব্যাস।

জগুদাদু বললেন, আমি তাতেই খুশি। বেশ করেছিস বিশ্ব। একটা পুকুরের বড় দরকার ছিল। তাতে মাছ চাষ করব। পরের বার এলে তোদের পুকুরের মাছ খাওয়াব।

বিশ্বমামা বললেন, দাঁড়াও জমামা, এই বিলু আর নীলু নামে গবেট দুটোকে একটা জিনিস দেখাই। গাছে হীরে ফলে না। তবে এটা কী?

ফস করে পকেট থেকে তিনি একটা পাথরের টুকরো বার করলেন। তার একটা দিক চকচক করছে, আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

জগুদাদু অবাক হয়ে বললেন, এ তো দেখছি সত্যিই একটা হীরে! কোথায় পেলি?

বিশ্বমামা বললেন, তোমার পুকুরে। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলুম, প্রত্যেকটা কয়লার টুকরো যাচাই করে দেখেছি। এই একটাই পাওয়া গেছে। একটা অন্তত না পেলে ভাগনে দুটোর কাছে আমার প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যেত।

আমাদের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলি তো? গাছ লক্ষ লক্ষ বছর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেলে কয়লা হয়ে যায়, তা জানিস তো? সেই কয়লা থেকে গ্র্যাফাইট, তার থেকে হীরে। তাহলে গাছ থেকেই হীরের জন্ম নয়?

জগুদাদু বললেন, এদিককার কোনও খনিতে কখনো কেউ পায়নি। তুই কী করে বুঝলি, এখানে হীরে থাকতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের জাম্বোর হাতে গ্রাফাইটের টুকরোটা দেখে। অবশ্য গ্র্যাফাইট থাকলেই যে হীরে থাকবে তার কোনও মানে নেই। তবু একটা চান্স নিলাম। ক্ষতি তো কিছু ছিল না।

হীরের পাথরটা হাতে নিয়ে আমরা সবাই নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। সত্যি সত্যি হীরে!

বিশ্বমামা বললেন যে, এখন অনেক কাটাকুটি করতে হবে। ঠিক মতন কাটতে না পারলে এর থেকে জেল্লা বেরোয় না। তবে এটা যে আসল হীরে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বিলুদা বললে, গ্র্যাফাইট থেকে যদি হীরে হয়, তাহলে গ্র্যাফাইটে খুব চাপ দিয়ে আরও হীরে বানানো যায় না?

বিশ্বমামা বললেন, না রে, গবেট, সম্ভব নয়। কয়লা জিনিসটা আসলে কী? কার্বন। গ্র্যাফাইটও কার্বন, হীরেও কার্বন। কিন্তু এদের পরমাণুর বিন্যাস আলাদা-আলাদা। প্রকৃতির খেয়ালেই এরকম হয়, আমাদের সাধ্য নেই পরমাণু বিন্যাস বদলাবার।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, এ হীরেটা যে আবিষ্কার করেছে, তারই পাওয়া উচিত। যদিও তোমার পুকুর থেকে উঠেছে।

জগুদাদু বললেন, তুই নিতে চাস তো নে, আমার আপত্তি নেই।

বিশ্বমামা বললেন, আমি কেন নেব? আমি তো আবিষ্কার করিনি। সে কৃতিত্ব জাম্বোকে দিতে হবে। জাম্বো যদি একটা গাছে হীরের ফুল না আঁকত, তাহলে ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসত না। দেখো, বিজ্ঞানের বড়-বড় তত্ত্বের চেয়েও মানুষের কল্পনা কত শক্তিশালী। ওইটুকু একটা ছেলে, একটা গ্রাফাইটের টুকরো পেয়েই হীরের ফুল আঁকছিল কেন? এই হীরেটা আমরা জাম্বোকেই উপহার দেব।

সবাই মিলে আমরা ডাকতে লাগলুম, জাম্বো, জাম্বো–